একটি সুররিয়াল অভিজ্ঞতা

৩০ আগস্ট দিনটি যে অন্যরকম একটি দিন হবে, সেদিন সকালবেলা আমি তা একেবারেই অনুমান করতে পারিনি। ভাইস চ্যান্সেলরকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা প্রায় চার মাস থেকে আন্দোলন করছেন। খুবই নিরামিষ ধরনের আন্দোলন; নিজেদের পদ থেকে পদত্যাগ করে সিঁড়ির ওপর তারা চুপচাপ বসে থাকেন। এ দেশে অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেকবার ভাইস চ্যান্সেলরকে সরিয়ে দেওয়ার আন্দোলন হয়েছে। খুব দ্রুত ফল পাওয়ার জন্য ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ করে দেওয়া হয়, ভাইস চ্যান্সেলরের বাসার পানি-ইলেকট্রিসিটির লাইন কেটে দেওয়া হয় এবং তাকে ঘরের ভেতর আটকে রাখা হয়। বিষয়টা অমানবিক। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে এ রকম একটা ঘটনার সমালোচনা করে আমি একটা লেখা লিখেছিলাম বলে আমার সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্দোলনরত শিক্ষকদের অনেক গালমন্দ শুনতে হয়েছিল। যাই হোক, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা তার ভেতর গেলেন না। ভাইস চ্যান্সেলর কথা দিয়েছেন- দুই মাস পরে নিজে থেকেই চলে যাবেন। সেটা বিশ্বাস করে অপেক্ষা করতে থাকলেন আন্দোলনরত শিক্ষকরা এবং দুই মাস পরে আবিষ্কার করলেন- 'কেউ কথা রাখে না!' কাজেই তারা প্রতিবাদ করে সিঁড়ির ওপর বসে থাকেন এবং মাঝেমধ্যে গরম বক্তৃতা দেন।

৩০ আগস্ট সিঁড়ির ওপর বসে থাকতে গিয়ে তারা আবিষ্কার করলেন, সেখানে প্রায় ভোর থেকে ছাত্রলীগের ছেলেরা বসে আছে। শিক্ষক হয়ে তারা তো আর ছাত্রদের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি করতে পারেন না। তাই ব্যানারটা হাতে নিয়ে রাস্তার মাঝে দাঁড়িয়ে রইলেন। ভোরবেলা যেহেতু অন্য শিক্ষকরা আসতে পারবেন না, তাই কী হয় দেখার জন্য আমি তাদের সঙ্গে গিয়ে ফ্ল্যাগপোস্টের বেদিতে বসে রইলাম।

ছাত্রলীগের ছেলেরা স্লোগান দিতে লাগল- 'জয় বাংলা'। স্লোগানটা শুনতে আমার ভালোই লাগে। কিন্তু ভাইস চ্যান্সেলরের কিছু হলে তারা কীভাবে আগুন জ্বালিয়ে দেবে কিংবা আন্দোলনরত শিক্ষকদের জামায়াতের দালাল বলে গালি দিয়ে কীভাবে তাদের হুঁশিয়ার করে দেওয়া হবে সেই স্লোগানগুলো শুনে আমি একটু অস্বস্তি অনুভব করছিলাম। তবে আমি কোনো দুশ্চিন্তা অনুভব করিনি। কারণ প্রচুর পুলিশ আছে। তার চেয়েও বড় কথা প্রক্টর আছেন, ছাত্রকল্যাণ উপদেষ্টা আছেন। ভাইস চ্যান্সেলরের পক্ষে কাজ করে যাচ্ছেন সে রকম বড় বড় শিক্ষক আছেন। এতজন গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষকের সামনে ছাত্রলীগের ছেলেরা নিশ্চয় আর যা-ই করুক শিক্ষকদের ওপর হামলা করবে না।

আমি মোটামুটি নিশ্চিন্ড় মনে বেদির ওপর বসে কাগজ বের করে একটা চিঠি লিখতে বসেছি। অনেক দিন থেকে পরিকল্পনা করে রেখেছিলাম আমাদের শিক্ষামন্ত্রীকে একটা ব্যক্তিগত চিঠি লিখব। সেখানে তাকে বলব আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যা মেটানোর জন্য তিনি যে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাদের সঙ্গে শলাপরামর্শ করেছেন সে কাজটি ঠিক হয়নি। একটা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় যেদিন থেকে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের কথা শুনে পরিচালনা করা শুর“ হয়; মোটামুটি নিশ্চিতভাবে বলা যায়, সেদিন থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মৃত্যু ঘটে যায়।

আমি যখন চিঠির আধাআধি লিখেছি তখন হঠাৎ ছাত্রলীগের ছেলেদের মাঝে এক ধরনের উত্তেজনা লক্ষ্য করি। উত্তেজনার কারণটা বুঝতে আমি রাস্ড়ার দিকে তাকিয়ে দেখি ভাইস চ্যান্সেলরের গাড়ি থেমেছে। তিনি গাড়ি থেকে বের হলেন। আন্দোলনরত শিক্ষকরা ব্যানার হাতে পথ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছেন। তাদের সঙ্গে কথা বলার কোনো চেষ্টা না করে তিনি পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেলেন। তার চারপাশে ছাত্রলীগের অসংখ্য কর্মী। তারা রীতিমতো কমান্ডো স্টাইলে অল্প কয়জন শিক্ষককে উড়িয়ে দিয়ে ভাইস চ্যান্সেলরকে বিল্ডিংয়ের ভেতর নিয়ে গেল। এক ধরনের হুটোপুটি হৈচৈ চেঁচামেচিথ কী হচ্ছে আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর, ছাত্রকল্যাণ উপদেষ্টা এবং অন্য সবাই চুপচাপ দাঁড়িয়ে পুরো ব্যাপারটি ঘটতে দিলেন। অল্প কয়জন বয়স্ক শিক্ষক, তার মাঝে মহিলাও আছেন, তাদের হামলা করেছে অসংখ্য কমবয়সী তর“ণ। পুলিশ ছোটাছুটি করছে কিন্তু নিশ্চিতভাবেই তাদের ওপর আদেশ দেওয়া আছে ছাত্রলীগকে তাদের কমান্ডো মিশনকে সফল করতে দিতে। তারা সেটা করতে দিল। আমি পাথরের মতো বসে থেকে পুরো ব্যাপারটি দেখলাম। কোনো সাংবাদিক বা টেলিভিশন ক্যামেরা নেই। ছাত্রলীগের ছেলেরা সেই সুযোগটি গ্রহণ করল। তারা এবার শিক্ষকদের হাত থেকে ব্যানারটি কেড়ে নিতে তাদের ওপর হামলা করল। অল্প কয়জন বয়স্ক শিক্ষক, অসংখ্য তেজি ছাত্রলীগ কর্মীর সঙ্গে কেমন করে পারবেন? তারা শিক্ষকদের নাস্ড়ানাবুদ করে ব্যানার কেড়ে নিল। আমার কাছে মনে হলো, আমি একটি সুররিয়াল দৃশ্য দেখছি। এর মাঝে কোনটি বাস্ড়ব, কোনটি পরাবাস্ড়ব এবং কোনটি অবাস্ড়ব- আমি আলাদা করতে পারছি না।

দীর্ঘ সময় ছাত্রলীগের কর্মীরা শিক্ষকদের ওপর হামলা করে গেল এবং বলা যায় আমি তখন আমার জীবনের সবচেয়ে হৃদয়বিদারক দৃশ্যটি দেখতে পেলাম। ছাত্রদের হাতে শিক্ষকদের নিগৃহীত হওয়ার দৃশ্যটি নিশ্চয় অত্যন্ড় চমকপ্রদ। কারণ প্রক্টর, ছাত্রকল্যাণ উপদেষ্টা এবং অন্য শিক্ষকরা একবারও ছাত্রদের নিবৃত্ত করার চেষ্টা করলেন না। আমি এক ধরনের বিস্ময়

নিয়ে দেখলাম মানুষ যেভাবে সার্কাস দেখে তারা সবাই ঘুরে ঘুরে সেই সার্কাসটি দেখে গেলেন।

এ শিক্ষকরা কেউ কিন্তু আমাদের দূরের মানুষ নন। তারা সবাই আমার খুব কাছের। আমরা দীর্ঘদিন পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ করেছি, গণিত অলিম্পিয়াড করতে সারাদেশ ঘুরে বেড়িয়েছি, এক গাড়িতে ঢাকা গিয়েছি, ফিরে এসেছি, গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টে পড়েছি। জামায়াত-বিএনপির দুঃসহ সময়ে আমরা টুইসডে আড্ডার প্রচলন করেছি, সেখানে একসঙ্গে রাজা-উজির মেরেছি। আমাদের আপনজন অসুস্থ হলে তারা হাসপাতালে দিনের পর দিন বসে থেকেছেন। তাদের পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে আমরা তাকে দেখতে গিয়েছি। ছেলেমেয়ের বিয়েতে গিয়েছি। এখন তারা অনেক দূরের মানুষ। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে তাদের সঙ্গে দেখা হলে তারা না দেখার ভান করে চলে যান। আগে হোক পরে হোক বর্তমান ভাইস চ্যান্সেলর একদিন চলে যাবেন। আমরা সব শিক্ষক থাকব। আমাদের ভেতরে যে বিশাল দূরত্ব তৈরি হয়েছে সেই দূরত্ব নিয়ে একটি বিশ্ববিদ্যালয় কেমন করে চলবে!

খবর পেয়ে এক সময় সাংবাদিকরা টেলিভিশন ক্যামেরা নিয়ে আসতে শুর" করলেন। ততক্ষণে যা ঘটার ঘটে গেছে। ছাত্রলীগের ছেলেদের স্ে-াগান ছাড়া আর কিছু নেই। ক্ষুব্ধ শিক্ষকরা তাদের ক্রুদ্ধ প্রতিক্রিয়ার কথা জানালেন। স্ে-াগানের কারণে সেগুলোও চাপা পড়ার উপক্রম হলো। আমি তখনও একই জায়গায় বসে আছি। মাঝেমধ্যেই আকাশ ভেঙে বৃষ্টি পড়ছে। বৃষ্টি আমার খুব প্রিয়। আমি চুপচাপ সেই বৃষ্টিতে বসে রইলাম। কী করব বুঝতে পারছি না! সাংবাদিকরা ঘুরেফিরে কাছে এসে আমার বক্তব্য শুনতে চাইলেন। আমি তাদের বললাম, আমার বলার কিছু নেই। আমি শুধু একজন দর্শক। শিক্ষকদের এ আন্দোলনে আমার কোনো ভূমিকা নেই। তাদের জন্য সহমর্মিতা জানানো ছাড়া আমি কিছু করিনি। তারপরও সাংবাদিকরা ঘুরেফিরে আমার কাছে ফিরে এলেন। বললেন, 'আপনি এখানে বসে থেকে সব দেখেছেন। আপনার কিছু একটা বলতে হবে।' আমি বাধ্য হয়ে তখন তাদের সঙ্গে কথা বললাম। যতদূর মনে পড়ে শেষ বাক্যটি ছিল এ রকমথ 'আমি আজকে যাদের দেখেছি, তাদের একজনও যদি সত্যি সত্যি আমাদের ছাত্র হয়ে থাকে তাহলে আমাদের গলায় দড়ি দেওয়া উচিত।' আমার এ কথাটির কারণে অনেকেই মনে খুব কষ্ট পেয়েছেন। এখন বুঝতে পারছি, এ রকম একটি কঠিন কথা বলা মোটেই ঠিক হয়নি।

সারাটি দিন খুব মন খারাপ ছিল। আমাদের নিজেদের ছাত্ররা তাদের শিক্ষকের ওপর এভাবে হামলা করবেথ এটি আমি নিজের চোখে না দেখলে কখনও বিশ্বাস করতাম না। নিজেকে সান্ত্বনা দিয়ে বোঝালাম, এ হৃদয়বিদারক ঘটনার হয়তো একটা ভালো দিক আছে।

আন্দোলন করা শিক্ষকরা যে বিষয়টা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন, সেটি এখন নিজে থেকে প্রমাণিত হয়ে গেল। যখন সবাই দেখবেন একজন ভাইস চ্যান্সেলর তার চেয়ারে বসে থাকা নিশ্চিত করতে ছাত্রলীগের মাস্ড়ানদের দিয়ে তাদের শিক্ষকদের ওপর হামলা করান, তখন সবাই নিশ্চয়ই আসল ব্যাপারটা বুঝে ফেলবেন। সরকার নিশ্চয়ই এ রকম একজন ভাইস চ্যান্সেলরকে দায়িত্বে রাখতে চাইবে না। আন্দোলনরত শিক্ষকরা যেটি চাইছেন, স্বাভাবিকভাবেই সেটি ঘটে যাবে।

মজার ব্যাপার হলো, আমি প্রথমে খবর পেলাম ভাইস চ্যান্সেলর হামলাকারী ছাত্রদের ধন্যবাদ জানালেন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য। আমার জন্য আরও বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। খবর পেলাম, শিক্ষামন্ত্রী কোনো একটা সভায় ছাত্রলীগ কর্মীদের আচরণের জন্য দুঃখ প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে বলেছেন, ভাইস চ্যান্সেলরের ওপর শিক্ষকদের হামলা করার কাজটি মোটেও উচিত হয়নি। শুনে আমি আকাশ থেকে পড়লাম। এ দেশের একজন শিক্ষামন্ত্রী সত্যি সত্যি বিশ্বাস করেন, অসংখ্য মারমুখো ছাত্রলীগ কর্মীর মাঝখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন বয়স্ক শিক্ষক-শিক্ষিকার পক্ষে ভাইস চ্যান্সেলরের ওপর হামলা করা সম্ভব! শিক্ষামন্ত্রীর কথা শুনে আমি কি হাসব, নাকি গলা ছেড়ে কাঁদব বুঝতে পারিনি।

দেশের একজন শিক্ষামন্ত্রী কীভাবে এ রকম আজগুবি একটা বিষয় বিশ্বাস করতে পারেন, সেটা অবশ্যি আমি পরদিন ভোরবেলাতেই বুঝতে পেরেছিলাম। অনলাইনে খবরটি নিশ্চয় আগেই ছাপা হয়েছেথ আমি দেখিনি। সারাদেশের সব পত্রপত্রিকা যখন ছাত্রলীগের এ হামলার নিন্দা করে খবর ছাপিয়েছে, সব টিভি চ্যানেল যখন খুব গুর"ত্ব দিয়ে খবরটি প্রচার করেছে, তখন প্রথম আলো তাদের খবরের শিরোনাম করেছে এভাবেথ 'ছাত্রলীগের হাতে শিক্ষক এবং শিক্ষকের হাতে উপাচার্য লাঞ্ছিত।' প্রথম আলো এ দেশের মূলধারার পত্রিকা। এ দেশের মূলধারার অনেক মানুষ এ পত্রিকা পড়েন। তাদের সার্কুলেশন বিশাল। কাজেই ঘটনার পরদিন বাংলাদেশের অসংখ্য মানুষ জেনে গেলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা এতই নিকৃষ্ট শ্রেণীর প্রজাতি যে, তারা ভাইস চ্যান্সেলরকে লাঞ্ছনা করতে সংকোচ বোধ করেন না। প্রথম আলোর ইতিহাসে এই প্রথমবার ছাত্রলীগের দুষ্কর্মের বর্ণনা 'হা-বিতং' করে ছাপা হলো না!

মনে আছে, আমি তখন মনে মনে খুব লম্বা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলাম। কারণ সত্যিকারের ঘটনাটি যখন ঘটে তখন সেখানে কোনো সাংবাদিক বা টেলিভিশন ক্যামেরা ছিল না। কাজেই যার যা ইচ্ছা তাই বলতে পারবে, আর সে কথা বিশ্বাস করে যার যা ইচ্ছা তাই লিখে বসে থাকতে পারবে। ঘটনার প্রতিবাদ করে কোনো লাভ নেই। অন্যায় কিছু ঘটলে সংবাদপত্রের

মাধ্যমে তার প্রতিবাদ করা হয়। একটা সংবাদপত্র যখন অন্যায় করে তখন হঠাৎ তার প্রতিবাদ করার কোনো জায়গা থাকে না!

'ধম্মের কল বাতাসে নড়ে' বলে একটা কথা আছে। আমি কথাটাকে আগে গুর"ত্ব দিইনি। কিন্তু হঠাৎ দেখতে পেলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ধম্মের কলটি বাতাসে নড়তে শুর" করেছে। কয়েক বছর আগে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা জায়গায় সিসি টিভি বসিয়েছিলাম। তার ফুটেজ বের করে আমরা হঠাৎ সেখানে পুরো ঘটনার একটা ভিডিও পেয়ে গেলাম। সেখানে অন্য অনেক কিছুর সঙ্গে দেখা গেল ছাত্রলীগ কর্মীরা একজন অধ্যাপকের দুই হাত ধরে রেখেছে এবং স্বয়ং ভাইস চ্যান্সেলর সেই অধ্যাপকের কলার ধরে ধাক্কাধাক্কি করছেন। শুধু তাই নয়; সেই অধ্যাপককে ছাত্রলীগের ছেলেরা আক্ষরিক অর্থে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে এবং আরেকজন শিক্ষক সময়মতো তার মাথাটা ধরে না ফেললে কী হতো আমরা এখনও জানি না! সিসিটিভির সেই ফুটেজ কতজন দেখেছেন, জানা নেই। শিক্ষামন্ত্রী দেখার সুযোগ পেয়েছেন কি-না কিংবা দেখে থাকলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সম্পর্কে তার মনোভাবের পরিবর্তন করেছেন কি-না আমার জানার কৌতূহল ছিল।

ভাইস চ্যান্সেলর শুর"তে ছাত্রলীগের দুর্বৃত্তদের সচেতন শিক্ষার্থী হিসেবে প্রশংসা করে থাকলেও প্রধানমন্ত্রী তাদের সরাসরি আগাছা হিসেবে উপড়ে ফেলার পরামর্শ দিলেন। কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ তিনজনকে বহিষ্কার করল। চক্ষুলজ্জার খাতিরে ভাইস চ্যান্সেলরও চারজনকে বহিষ্কার করলেন। (তারা অবশ্য নিয়মিত পরীক্ষা দিয়ে যাচ্ছে)। দেশের কাছে অন্ড়ত একটি বিষয় জানানো সম্ভব হলো, সত্যি সত্যি ছাত্রলীগের ছেলেরা তাদের শিক্ষকদের ওপর হামলা করেছিল।

আমার একটিই প্রশ্নথ 'কেন করেছিল?' মজার ব্যাপার হলো, সেটি নিয়ে কারও মাথাব্যথা নেই। ছাত্রলীগের ছেলেরা ঘোরতর অন্যায় করেছিল, তাদের শাস্ড়ি দিতে হবেথ সেটাই হয়ে গেল মূল বিষয়। শিক্ষকদের এ নিরামিষ ধরনের গান্ধীবাদী আন্দোলনের সঙ্গে আমি সেভাবে যুক্ত ছিলাম না। শুধু একদিন দূর থেকে বসে দেখার চেষ্টা করে সারাজীবনের জন্য একটা ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা নিয়ে এসেছি। আমার বাসায় টেলিভিশন নেই, আমি ফেসবুক করি না। কাজেই বিষয়টি নিয়ে কী ধরনের আলোড়ন হয়েছে আমি জানি না। কিন্তু পরদিন ঢাকা থেকে অনেককেই সিলেটে চলে আসতে দেখে একটু আঁচ করতে পেরেছিলাম। সাংবাদিকরা আমার পিছু ছাড়েন না এবং আমি তোতা পাখির মতো শুধু একটা কথাই বলে গেছিথ ছাত্রলীগের কর্মীরা যে অন্যায় করেছে, তার থেকে একশ' গুণ বেশি অন্যায় করেছেন যারা তাদের ব্যবহার করেছেন তারা। কাজেই মূল অপরাধীর শাস্ড়ি না দিয়ে শুধু ছাত্রলীগের ছেলেদের শাস্ড়ি দিলে

প্রকৃত অপরাধীর শাস্ড়ি দেওয়া হবে না। আমি মোটামুটি বিস্ময় নিয়ে আবিষ্কার করলাম, পেছন থেকে গডফাদাররা কী করেছে সেটি নিয়ে কারও মাথাব্যথা নেই। সামনাসামনি লাঠিয়াল বাহিনী কী করেছে সেটি নিয়ে সবার একমাত্র মাথাব্যথা।

যাই হোক, এ নিরামিষ আন্দোলনে শিক্ষকরা যেহেতু কখনোই ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ করেননি; তাই ছাত্ররা কোনোভাবেই ক্ষতিগ্রাস্ড় হয়নি। সে কারণে তাদের সেটা নিয়ে কোনো মাথাব্যথা ছিল না। কিন্তু যখন শিক্ষকরা ছাত্রলীগ কর্মীদের হাতে নিগৃহীত হলেন তারা হঠাৎ নড়েচড়ে বসেছে। একজন ছাত্র কখনোই তার শিক্ষকের অপমান সহ্য করে না। কাজেই খুব স্বাভাবিকভাবেই তারা ক্ষুব্ধ হয়ে বের হয়ে এসেছে। তারা কী করবে আমাদের জানা নেই। তাই সামনের দিনগুলোতে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের কপালে কী আছে আমরা কেউ জানি না। শুধু একটা বিষয় জানি, এ বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা দলের নানা মতের শিক্ষকরা পাশাপাশি থাকতেন। এখন তাদের ভেতর যোজন যোজন দূরত্ব। আমি কখনোই এ রকম বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বপ্ন দেখিনি!

২.

৩০ আগস্ট যখন ছাত্রলীগের ছাত্ররা শিক্ষকদের ওপর হামলা করেছে আমি তখন হতবাক হয়ে কাছাকাছি একটা জায়গায় বসেছিলাম। মাঝেমধ্যে অঝোর ধারায় বৃষ্টি হয়েছে। আমি একা একা সেই বৃষ্টিতে বসে থেকেছি। প্রশ্ন ফাঁস নিয়ে প্রতিবাদ করার সময় আমি একদিন শহীদ মিনারে বসে ছিলাম। সেদিনও এভাবে বৃষ্টি হয়েছিল। আমি বৃষ্টিকে ভালোবাসি, তাই মনে হয় বৃষ্টিও আমাকে ভালোবাসে। যাই হোক আমার সেই একাকী বৃষ্টিতে ভিজে ঝড়ো-কাক হয়ে থাকার ছবিটি মনে হয় ব্যাপকভাবে প্রচার হয়েছে এবং কোনো এক অজ্ঞাত কারণে সবার মনে খুব দাগ কেটেছে। ডেইলি স্টার পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠাতেও আমার সেই বিপর্যস্ড় ভঙ্গিতে বসে থাকার ছবিটি ছাপা হয়েছে এবং সত্যি কথা বলতে কি, সেই ছবি দেখে আমি নিজেও চমকে উঠেছিলাম!

এরপর আমি সারাদেশের অসংখ্য মানুষের কাছ থেকে সমবেদনার সাড়া পেয়েছি। আমি জানি, আমি অসংখ্য মানুষের চক্ষুশূলথ সেটি আমাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করে না। কারণ আমি তাদের বিপরীতে এ দেশের অসংখ্য মানুষথ বিশেষ করে তর"ণ প্রজন্ম এবং শিশু-কিশোরের ভালোবাসা পেয়েছি। আমি তাদের সবাইকে জানাতে চাইথ এ দেশ, দেশের মানুষ নিয়ে আমার ভেতরে কোনো হতাশা নেই। আমি মোটেও হতোদ্যম নই। আমি নিজেকে কখনোই পরাজিত একজন মানুষ ভাবি না। আমার সেই বিপর্যস্ড় ঝড়ো-কাকের ছবি দেখে কেউ যেন ভুল না বোঝে!

বেঁচে থাকতে হলে মাঝেমধ্যে ঝড়ঝাপটা সইতে হয়। কিন্তু সেই ঝড়ঝাপটার কারণে একজন মানুষ কখনও ভেঙে পড়ে না! কী কারণ জানা নেই, আমি এ দেশের অসংখ্য মানুষের ভালোবাসা পেয়েছি। সেই ভালোবাসা আমি কীভাবে তাদের ফিরিয়ে দেব ভেবে কূল পাই না!

আমার মনে হয় না, এ বাংলাদেশে আমার চেয়ে আশাবাদী কেউ আছেন, কিংবা আমার চাইতে আনন্দে কেউ আছেন!